

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

সুমিত্রা বারুই*

প্রাপ্ত: ২৭.০২.২০২৪

পরিমার্জন: ০৩.০৫.২০২৪

গৃহীত: ২৯.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি পিতার কাছে শিক্ষানবীশ করেন এবং পরবর্তীতে স্যার আশুতোষ এর মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ হিসাবে যুক্ত থাকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হন। শিক্ষাক্ষেত্রে সংযুক্ত থাকাকালীন সময়ে ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেস মনোনীত পদপ্রার্থী রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু কংগ্রেস আইনসভা বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কংগ্রেস প্রার্থীদের সাথে তিনিও আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতির স্তরে তাঁর পদার্পণ হয় যা তাঁকে ক্রমশ সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে উন্নীত করে। এহেন ব্যক্তিত্বের অধিকারী, শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক কর্মজীবন সম্পূর্ণ রূপে বিতর্ক যুক্ত। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর কর্মকান্ডকে কেবলমাত্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই পর্যায়ে আমার আলোচনার মূল বিষয় হল এটা বোঝার চেষ্টা করা যে কি ছিল তাঁর চিন্তার স্তর যা তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শ থেকে সরে এসে হিন্দু মহাসভার মতাদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট করেছে এবং পরবর্তীকালে যা থেকে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এই সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের মাধ্যমে করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গীয় রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পদত্যাগ, জনসংঘ প্রতিষ্ঠা, কাশ্মীর।

*পিএইচ.ডি. গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

e-mail: baruisusmita20@gmail.com

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক দশকের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। মাত্র ২৩ বছর বয়সে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে পিতা স্যার আশুতোষের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য পদ লাভ করেন। পিতার কাছে শিক্ষানবিশ করার সময় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদানের চেহারা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাধারা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার যা মৌলিক পরিবর্তন আনা উচিত সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা তৈরি হচ্ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই ভূমিকা তাকে অতি দ্রুত উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছিল। যার ফলে তাঁর পিতা স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসাবে ওই পদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আসীন হন। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন ঘটেছিল একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবেই, যখন তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিতে জড়ানো নয়, বরং আইনসভায় উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সাহায্য করা।^১ কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, বাংলার মুসলিম লীগের ক্ষমতা লিপ্সু মনোভাব এবং কংগ্রেসের চরম উদাসীনতার ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতি ক্রমশ তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আর এমতাবস্থায় তিনি যদি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়া থেকে নিজে দূরে সরিয়ে রাখেন তাহলে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তা তা কখনোই বাস্তবে রূপায়িত হবেনা।

এছাড়াও মুসলিম লীগ সরকার সেইসময় ব্রিটিশ সরকারের মদতে বিভিন্ন বিল পাস করেন, তার মধ্যে কলকাতা মিউনিসিপাল বিল ও মধ্যশিক্ষা পর্যদ অর্থাৎ সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে দেখা যায় যে, কলকাতার দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যা এতদিন হিন্দুদের অধীনস্থ ছিল তা ক্রমশ মুসলিমদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে এবং এই অবস্থায় বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন আনা না হয় তাহলে তা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে মোটেই সুখকর হবে না।^২ অতএব বলা যেতে পারে শিক্ষার আঙিনা থেকে ক্রমশ রাজনীতির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার পিছনে শ্যামাপ্রসাদের ক্ষমতালিপ্সু মনোভাবের পরিবর্তে তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মানুষের যথার্থ উন্নতির পরিকল্পনাই বিশেষভাবে দায়ী। এপ্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের একটি উক্তি বিশেষত উল্লেখ করা যায়। অখন্ড বাংলার আইন সভায় মন্ত্রীত্বকালীন সময়ে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন,

“আমার প্রবণতা মূলত শিক্ষামূলক প্রশাসনের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং আমি একজন রাজনীতিবিদের কোলাহলপূর্ণ এবং ধূলোময় কর্মজীবনের প্রতি কখনোই আকর্ষণ অনুভব করিনি। আমি ভেবেছিলাম আমার দেশকে সেবা করার সবথেকে ভালো উপায় হল শিক্ষার পথ”^৩

এর থেকেই বলা যায় যে, শ্যামাপ্রসাদ কখনোই চাননি রাজনীতির কোলাহলপূর্ণ ও ধূলোময় কর্মজীবনে প্রবেশ করতে বরং শিক্ষা ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করতে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গীয় রাজনীতি

যদিও শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটেছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবেই কিন্তু কংগ্রেসের সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগের সাথে সাথে শ্যামাপ্রসাদও দলীয় মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং এই ঘটনার পর শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের অবসান ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পূর্ণ সময়ের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশের মূল কারণ ছিল ১৯৩৭ পরবর্তী বাংলা হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। এই দুর্দশার মূল নিহিত ছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার চরম সাম্প্রদায়িক কর্মধারার মধ্যে। এছাড়াও আইন দ্বারা হিন্দুদের ন্যায্য

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়াও সরাসরি হিন্দুদের উপর অত্যাচার ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ নিতে আরম্ভ করে। হিন্দু মন্দিরগুলিকে অপবিত্র করা, হিন্দু বিগ্রহ বা প্রতিমা ভেঙে দেওয়া এবং হিন্দু নারীর প্রতি অত্যাচার ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছিল।^৪ এই অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেস তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বজায় রাখতে হিন্দুদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিষয়ে তেমন দৃষ্টিপাত করবেন না। যার ফলে বাংলার হিন্দুরা কংগ্রেসের উপর থেকে ক্রমশ তাদের আস্থা হারাচ্ছিল। এরই মধ্যে ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর কলকাতায় আসেন এবং হিন্দু মহাসভার আদর্শ প্রচার করেন। এই সময় বাংলার বহু বিশিষ্ট নেতৃবর্গ তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সাভারকরের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং তৎকালীন সময়ে বাংলার হিন্দুদের দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অবস্থা পরিবর্তন কংগ্রেসের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। সেই জন্য তিনি হিন্দু মহাসভার মতাদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মহাসভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এবং অতি দ্রুত তিনি ওই সংগঠনের সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি পদে উন্নীত হন।

শ্যামাপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুরা ছাড়া ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সহযোগিতা অধিক মাত্রায় নেই। তিনি মনে করতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই কঠোর সংগ্রাম করে, সর্বস্ব উৎসর্গ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে আর হিন্দু মহাসভার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সংগ্রামকে কঠোরতর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'সংগ্রাম আমরাই করব, কিন্তু জয়লাভ করলে তার সুফল সকলের সঙ্গে ভাগ করেই ভোগ করব।' পরবর্তী সময়ে শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় আইন সভায় হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভার জোটে, জয়লাভ করেন। এবং এই মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা রূপে শ্যামাপ্রসাদ

রাজনীতিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তিনি নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন সময়ে তিনি বাংলার হিন্দুদের অধিকারের দাবিতে বিশেষভাবে সোচ্চার হন। তিনি বাংলার হিন্দুদের ওপর মুসলিম লীগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বারংবার কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের মানুষদের সমর্থনে ক্ষমতায় আসার সত্ত্বেও হিন্দুদের অধিকার নিয়ে বিশেষ কোনো দিকপাত করেননি। এরই মধ্যে ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে এবং সমগ্র বাংলা ও পঞ্জাবকে পাকিস্তানের সংযুক্তিকরণের কথা বলেন তখন এটিকে কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গ শুধুমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ এই প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে জনমত আদায়ের সচেষ্ট হয়।

সভায় দাবি উত্থাপিত হওয়ার প্রথম থেকেই শ্যামাপ্রসাদ এই দাবির বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু প্রথম থেকেই ভারত বা বাংলা কোনও বিভাগেরই সমর্থক ছিলেন না। এমনকি কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুরা চরম লাঞ্চিত, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরও তিনি বাংলা ভাগের দাবি করেননি। দাঙ্গার একমাস পর বাংলার আইনসভায় সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা কালেও তিনি বাংলা ভাগ তো দূরের কথা ভারত ভাগের পক্ষেও কোন কথা বলেননি। বরং দাঙ্গায় নিহত হিন্দু মুসলিম গরীব জনসাধারণের নির্মম হত্যার জন্য লীগ নেতাদের অভিযুক্ত করেন এবং গভীর মর্ম বেদনা প্রকাশ করেন।^৫

ভারত ভাগের অনিবার্য পরিনতি স্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলা ভাগে সোচ্চার হলেন। তাঁর দাবি-যে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হচ্ছে, সেই একই ভিত্তিতে প্রদেশও ভাগ করতে হবে। কারণ তিনি মনে করেছিলেন সমগ্র বাংলা যদি পাকিস্তানে চলে যায় তাহলে বাংলার হিন্দুদের অবস্থা হবে শোচনীয়। এমতাবস্থায় তিনি বাংলা ভাগের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনগণকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন এবং তারই উদ্যোগে অর্ধেক বাংলা ভারতে থেকে যায় এবং

স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। বাংলাকে ভাগ করা শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে নেহেরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, “আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন”। উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে, “আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।”^৭

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ

বঙ্গীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা তাঁকে অতি দ্রুত সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে উন্নীত করেছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির দ্রুত পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয় ওয়াভেল তাঁর প্রায় ১১টি প্রাদেশিক গভর্নর, কমান্ডার ইন চিফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টার পরামর্শে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ভারতবর্ষে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যে, যদি গান্ধী ও জিন্নার মত দেশের বড় বড় নেতৃবর্গ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মত হন তাহলে ওয়াভেল আরো একটি প্রাতিষ্ঠানিক সম্মেলন সংগঠিত করবার চেষ্টা করবেন এবং একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের উপর অর্পণ করবেন। ১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পরিস্থিতিতে বদল আনে। লর্ড ওয়াভেল অচলাবস্থার অবসানের জন্য নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানান। সিমলায় অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় নেতাদের একটি সম্মেলনে ওয়াভেল পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে হিন্দু মহাসভা এই সম্মেলন সভার বাইরে ছিলেন। মহাসভাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ৩রা জুলাই এর মধ্যে সমগ্র দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে গণপরিষদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত কিছু অ-কংগ্রেসীয় নেতৃবর্গকেও সংযুক্ত করতে পারেন। ৭ই জুলাই ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত কাউন্সিলের প্রস্তাবিত সদস্যের নামের তালিকা শ্যামাপ্রসাদের নাম সংযোজন করা হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের পূর্বানুমতি ছাড়াই।^৮ আর এভাবেই ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদকে শিল্প ও সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রদান করা হয়েছিল।

শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসাবে আড়াই বছর শ্যামাপ্রসাদ ওই পদে বহাল থাকাকালীন সময়ে তাঁর কর্মপদ্ধতি অন্যান্যদের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। চিত্তরঞ্জন লোকামোটিভ ফ্যাক্টরি, সিদ্দি ফার্টিলাইজার, হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফ্ট নামক স্বাধীন ভারতে তিনটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সংঘটিত করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে মন্ত্রনা দপ্তরের সহায়তায় চণ্ডীগড় এর কাছে শতদ্রু নদীতে বাঁধ দিয়ে বিশাল ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প শুরু হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর স্টিল কারখানা, ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্তান এরোনোটিকস কারখানা প্রভৃতি উদ্যোগ ও প্রকল্প ওই সময় শিল্প মন্ত্রকের সহায়তায় গড়ে ওঠে। এইসবের পিছনে ছিল শ্যামাপ্রসাদের সুপারিকল্পিত নীতি অদম্য আগ্রহ ও কর্মদ্যোগ। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ বাস্তবও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শ্রম সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন। মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। শ্রমিক ও মালিকের উভয়ের মধ্যে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবই শিল্পের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ বলে তিনি মনে করতেন। শ্রমিকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য।^৯

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ ও ভারতীয় জনসংঘের জন্ম

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পকে একটি নতুন রূপ-প্রদানের প্রচেষ্টা করেছিলেন তখনই ১৯৫০ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) এক ভয়াবহ হিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটে যা শ্যামাপ্রসাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্বরূপ। আন্দাজ করা হয়ে থাকে যে এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত হয়েছিল এবং অগণিত হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে তার মত বিরোধ ঘটে এবং তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের কারণ হিসাবে ১৯ এপ্রিল ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংসদে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্যামাপ্রসাদ বলেন, “আমার পদত্যাগের পিছনে কোন ব্যক্তিগত কারণ নেই। ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে আমার মত পার্থক্যগুলি মৌলিক এবং এই মত পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও ওই সরকারের একজন সদস্য হিসাবে ওই সরকারে থাকা আমার পক্ষে ন্যায় সম্ভব বা সম্মানজনক নয়, যেখানে তাদের দ্বারা গৃহীত নীতি আমি অনুমোদন করতে পারি না।” তিনি আরো বলেন, “পাকিস্তানের প্রতি আমাদের মনোভাব নিয়ে আমি কখনোই সন্দেহিত ছিলাম না। পাকিস্তান আমাদের এই ভালো মানুষীকে দুর্বলতা হিসাবে দেখেছে এবং যার ফলে তারা আরো সমস্যা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। যা আমাদেরকে আরো যন্ত্রণা দিয়েছে এবং এমনকি আমাদের নিজেদের মানুষের কাছে নিজেকে অনেক হেয় করেছে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা পাকিস্তানের প্রতি রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করেছি যার ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে নস্যাত করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।”^{১০} শ্যামাপ্রসাদের উক্তি থেকে এটাই ব্যাখ্যা করা যায় যে কোন ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে বা কারনকে কেন্দ্র করে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেননি বরং পূর্ব বাংলার মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা তাকে বাধ্য করেছে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মন্ত্রীসভায় নির্বাচিত মন্ত্রীরা হলেন জনগণের প্রতিনিধি আর সেই মন্ত্রীসভায় থেকে যখন তিনি জনগণের দুঃখ দুর্দশায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারছেন না তখন সেই মন্ত্রীসভায় থাকার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। এবং সেজন্যই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের ঘটনা শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদের জীবনেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্বরূপ। তিনি বাংলার প্রাদেশিক নেতা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত করলেও অতি দ্রুত তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। যা তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে বহুল পরিচিত করে তোলে। এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের ঘটনা তাকে ভারতের সমস্ত অ-কংগ্রেসীয় নেতৃবর্গের প্রধান মুখপাত্রের উপনীত করেছিল। স্বাধীনতার পর শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু মহাসভার পরিধি বিস্তারিত করতে হবে। কিন্তু মহাসভার কর্মধারেরা তাঁর সেই পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং সেই কারণে তিনি মহাসভার কার্যনির্বাহী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগের পর সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে টিকে থাকার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। যার ফল স্বরূপ ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘের জন্ম হয়। ভারতীয় জনসংঘের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, তিনি এবং তাঁর সমস্ত সহকর্মীরা ঘোষণা করছেন যে এই দলের দ্বার জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় জন্য উন্মুক্ত থাকবে।^{১১} আর এভাবেই স্বাধীন ভারতে সংগঠিত প্রথম কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতীয় জনসংঘের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং ভারতীয় জনসংঘের জন্ম লগ্ন থেকেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ সংগ্রাম করে যান কাশ্মীরকে নিয়ে। ১৯৪৮ সালে ২৭শে অক্টোবর পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করবার জন্য ভারতভুক্তির সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন তদানীন্তন কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং। জন্মু ও কাশ্মীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অংশ ততক্ষণে অবশ্য পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায় এবং বাকি অংশ ভারতীয় সৈনিকরা অধিকৃত করেন। এই অবস্থায় কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার রক্ষাকবচ প্রদান করা হয় এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বিষয়টিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিকরণ করেন। কাশ্মীরকে ৩৭০ নম্বর ধারা দ্বারা বিশেষাধিকার প্রদানের বিরোধিতা ভারতের বহু নেতৃবর্গ করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এই বিশেষাধিকার প্রক্ষেপে বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট প্রায় ৫০০ দেশীয় রাজ্য ভারতভুক্তির সনদে স্বাক্ষর করে ভারতবর্ষের অন্তর্গত হন, কিন্তু তাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ অধিকার প্রদান করা হয়নি সেই সব দেশীয় রাজ্য যে সনদে স্বাক্ষর করেছিল, জন্মু-কাশ্মীরও সেই একই সনদে স্বাক্ষর করে ভারতভুক্ত হয়েছিল। তাহলে শুধুমাত্র জন্মু-কাশ্মীরের জন্য এই অধিকার কেন।^{১২}

কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক প্রক্রিয়া আইন অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন ও কিভাবে এই জয়গার জন্য বিশেষ কোনো সাংবিধানিক আইন থাকতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। এমনকি যখন পন্ডিত নেহেরু সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার খসড়া বাবাসাহেব আম্বেদকরকে পাঠান, তখন তিনি বলেন যে, “তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শেখ আব্দুল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে ভারতের আইন মঞ্জী হননি।” তিনি আরো বলেন, “শেখ আব্দুল্লাহ কিভাবে ভাবতে পারে যে ভারত জম্মু ও কাশ্মীরকে রক্ষা করবে, সেতু ও রাস্তা তৈরি করবে, জনগণকে খাওয়াবে, সেখানে কোন রাজনৈতিক অধিকার ছাড়াই?”^{৩০}

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ শ্যামাপ্রসাদের বাকরুদ্ধ করতে পারেনি। পার্লামেন্টে থাকাকালীন সময়ে বারংবার তিনি কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে অকাটা যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা সরকারের তোষণ নীতির সমালোচনা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ পন্ডিত নেহেরুকে এক পত্রে লেখেন:

“জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ। সুতরাং ঐ রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং তার উপর লক্ষ্য রাখবার অধিকার ভারতের জনসাধারণের আছে। জম্মুর অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করছেন, ভারতের অন্যান্য অংশ যে শাসন বিধির দ্বারা শাসিত হচ্ছে, সেই একই সংবিধান অনুসারে তাঁদেরও শাসনকার্য পরিচালিত হবে কিনা? তাঁরা আরো জানতে চান যে মুসলিম প্রধান কাশ্মীর উপত্যকার মানুষেরা যদি ভিন্নমত পোষণ করেন (ভারতীয় সংবিধান না মানেন) তবে তার জন্য জম্মু বাসীরা কেন বিপদের সম্মুখীন হবেন। বাস্তবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ক্রমশ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে— আপনি ও শেখ আব্দুল্লাহ কাশ্মীর বিভাগ (অর্থাৎ) পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা? আপনি বরাবরই এই জরুরি প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন। ভারতের বাকি সকল অংশে যখন ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগ যোগ্য বিবেচিত হয় তখন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে তা প্রযুক্ত হবে না কেন?”^{৩১}

সংসদে কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্কে বারংবার শ্যামাপ্রসাদ অকাটা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে নেহেরু সরকারের নীতির সমালোচনা করেছেন। ৭ই আগস্ট ১৯৫২-র বিতর্কে আবার তিনি শাণিত যুক্তি সহকারে তাঁর মত তুলে ধরেন—কাশ্মীর যখন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তখন কি করে এক দেশে দুই সংবিধান, দুই পতাকা, দুই প্রধান থাকবে? যদিও এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর তিনি কখনোই পাননি।^{৩২}

এভাবেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে আলোচনায় বিস্ময়কর ভাবে দেখা যায় যে, দেশ মাতৃকার জন্য তাঁর যে ভূমিকা সেটি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে এবং তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাম্প্রদায়িকতার তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে কেবলমাত্র একজন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত বাস্তবতা থেকে দূরে সরে এসে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে আবদ্ধ রেখে শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাকে রূপ দানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সবশেষে বলা যায় যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন অত্যন্ত ঘটনা বহুল। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল এবং পর্যায়ক্রমে এই ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশ:

১. রায়, তথাগত, (১৯২৫), *ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ*, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৮-৯।
২. *তদেব*, পৃ. ৯৪ (পরার্থ)।
৩. Banerjee, Anil Chandra, (2000). *A Phase in the life of Dr. Syamaprasad Mookerjee 1937-1946*, Asutosh Mookerjee Memorial Institute, Kolkata, p.20.
৪. Adak, Naba Kumar, (2013). *Syama Prasad Mookerjee: A Study of His Role in Bengal Politics (1929-1953)*, Kunal Books, New Delhi, pp. 179-180.
৫. রায়, কালিদাস, (২০০৮), *শ্যামাপ্রসাদ*, শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন, আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, পৃ. ৫৯।

৬. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, (২০১৮), *শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ*, তুহিনা প্রকাশনী, 'লেখকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'।
৭. রায়, তথাগত, (১৪২৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯ (পরার্থ)।
৮. Chatterjee, Prashanto Kumar, (2010). *Syama Prasad Mookerjee and Indian Politics*, Foundation Books, New Delhi, pp. 86-87.
৯. রায়, কালিদাস, (২০০৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০-১৪২ (পরার্থ)।
১০. Madhok, Bal Raj, (2001). *Portrait of a Martyr: A Biography of Dr Shyama Prasad Mookerjee*, Rupa.Co, New Delhi, p.107.
১১. Madhok, Bal Raj, (2001). *op.cit*, pp. 107-108.
১২. রায়, কালিদাস, (২০০৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০ (পরার্থ)।
১৩. Mookerjee, Dr. Syamaprasad, (2003). *Kashmir Issue Correspondence Speeches and Reports (1947-1953)*, Asutosh Mookerjee Memorial Institute, Kolkata, p. xxiv.
১৪. রায়, কালিদাস, (২০০৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১ (পরার্থ)।
১৫. *তদেব।*